দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরি... ডকুমেন্টেশন
28 MAY 1989
তারিখ 28 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3
৩১
১৪

প্রসঙ্গ: কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোটা

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এদেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার একমাত্র বিদ্যাপীঠ। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতি শিক্ষা বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ছয়শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়ে থাকে। ভর্তির ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব যে নিয়ম পালন করে থাকেন তন্মধ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে যে বিষয়টি বিভিন্ন মহলে সমালোচনায় সম্মুখীন হচ্ছে অত্যন্ত প্রকটভাবে তাহলো "বিশেষ ভর্তি কোটা ব্যবস্থা"। এই ব্যবস্থার আওতায় বিগত কয়েক বছর হলো এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে স্থানীয় এলাকার লোকজনদের ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষক কর্মচারী কর্মকর্তাদের সন্তানগণ। ভর্তি ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতাও এদের জন্য শিথিলযোগ্য। ১৯৮৮-৮৯ ভর্তি সেখানেও এর পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ। অর্থাৎ প্রতি শিক্ষা সেশনে কমপক্ষে ১৮ থেকে ২০ জন ছাত্র অত্যন্ত কম মেধা নিয়ে বিশেষ কোটা ব্যবস্থার পিছন দরজা দিয়ে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক কোটা, খেলোয়াড় কোটা ইত্যাদিতো রয়েছেই। হাস্যকর হলেও সত্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থাকলেও কোটা ব্যবস্থায় যেসব খেলোয়াড়ের ভর্তি করানো হয় তারা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কোন পদক আনতে পারে না বরং কেউ কেউ শেষ-স্থানটি পেয়েই চলে আসে। তাহলে এসব কোটা রাখার অর্থ কি? উল্লেখ্য যে, এহেন ব্যবস্থা থাকার জন্য প্রতি বছর ভর্তির সময় অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে দেশের অপর একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট (BUET) কিন্তু এইসব কোটা ব্যবস্থা নেই। সেখানে শুধু উপজাতীয় কোটা ১০%। যা স্বাভাবিক নিয়মে সবাই মেনে নেয়। এইসব বিশেষ কোটা ব্যবস্থা জিইয়ে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে ভীষণভাবে।

তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সচেতন ছাত্র হিসেবে কর্তৃপক্ষের নিকট আমার অনুরোধ—আপনারা এইসব বিশেষ কোটা ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দিন।

—সুব্রত নন্দী কৃষি অনুষদ, ৪১২, সোহরাওয়ার্দী হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় 'সাবমিট' প্রথার বিরোধিতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত একটির স্থলে প্রত্যেক বিষয়ে তিনটি করে পাঠ্যবই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে ২২-৫-৮৯ তারিখের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমরা মনে করি এই সাবমিট প্রথা দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক কুফল বয়ে আনবে।

স্বাধীনতার আগে ১ম হতে নবম দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক পুস্তক অনুমোদন ও বেসরকারী প্রকাশকদের মাধ্যমে বাজারজাত করা হত, যা ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে এবং উক্ত প্রথা বাতিল হয়ে বর্তমান প্রথায় চলে এসেছে। যে সাবমিট প্রথা পূর্বেই ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তা পুনরায় প্রবর্তন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

বইয়ের মান উন্নয়ন আমরাও চাই। প্রথমত প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মান উন্নয়ন করার পর পরবর্তী ধাপে মাধ্যমিক স্তরে মান উন্নয়ন করা দরকার। সেই মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে অভিজ্ঞ লেখকদের মধ্য হতে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ভাল বই বাছাই করতঃ বর্তমান পদ্ধতিতে বাজারজাত করা যেতে পারে।

পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে চাই, সাবমিট প্রথা প্রবর্তিত হলে দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হবে। বইয়ের মান যাচাই না করে উৎকোচের মাধ্যমে বই নির্বাচন করার আশংকা রয়েছে।

অনুমোদিত বইগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বইখানিই যে ভাল বাজার পাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সাংগঠনিক জাল বিস্তার করে দুর্নীতির মাধ্যমে নিকৃষ্টতম বইয়েরও ভাল বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব, যা পূর্বেও হয়েছিল।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে এই প্রথা কোনভাবেই জনহিতকর নয় বলে এই প্রথা দেশ ও জাতির জন্য নিশ্চিত চরম দুর্ভোগ বয়ে আনবে।

গত ২৫শে মার্চ, ১৯৮৯ দৈনিক ইত্তেফাকে এই সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা প্রতিবাদ সভা করেছি এবং সমিতির পক্ষ হতে গত ৩রা মে, ১৯৮৯ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে উক্ত প্রথার কুফল সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব পেশ করেছি।

প্রায় সাত হাজার সদস্য-বিশিষ্ট বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি পুস্তক প্রকাশনার সাথে জড়িত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতামত এবং এদেশের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের কথা বিবেচনা না করে মুষ্টিমেয় অর্থশালী প্রকাশকের স্বার্থে সাবমিট প্রথা প্রবর্তন না করার জন্য অনুরোধ করছি।

মো: আবু তাহের,
মহাসচিব
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও
বিক্রেতা সমিতি।